BANGABHARATI - A National Research Journal of Bengali
ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধার মনস্তত্ত্ব

ড. রাজেশ কুমার দত্ত
স্টেট্ এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়, পঃবঃ।

প্রবন্ধসার

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে নানান দিক থেকে বিচার করার প্রবণতা গত একশত বছর ধরে বাংলা সাহিত্যকে নানা মাত্রায় সমৃদ্ধ করেছে। আধুনিক সমালোচনারীতির দিক থেকে মনস্তত্ত্ব সম্মত ভাবনায় এ কাব্যকে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন অনেকে। আমরা বর্তমান আলোচনায় এখানকার শ্রীরাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশের একটা ধারাপথ পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী। প্রথম খণ্ড থেকে একেবারে রাধাবিরহ পর্যন্ত রাধাকে কবি সুচতুরভাবে মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোতে ফেলে নির্মাণ করেছেন। আমাদের আলোচনার পরতে পরতে তার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের আলোচনা বৈষ্ণব সাহিত্যকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সাহিত্য সমালোচনার নতুন দিশা দেখাবে। মধ্যযুগের সাহিত্য সমালোচকের কাছে এই আলোচনা নবতর সংযোজন।

বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে প্রধান তিনটি চরিত্রকে অবলম্বন করে — রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই। কাব্যের নামকরণে কৃষ্ণ প্রাধান্য পেলেও কাহিনী আলোচনা করলে দেখতে পাবো রাধা একাব্যের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কাব্যের শুরু 'জন্মখন্ড' থেকে শেষ 'রাধাবিরহ' পর্যন্ত রাধা চরিত্রের মানসিক বিবর্তনই মুখ্য বিষয়। কিভাবে কৃষ্ণ বিরাগিনী রাধা কৃষ্ণ অনুরাগিনী প্রেমপাগলিনী রাধাতে পরিণত হয়েছেনে তা অত্যন্ত নিপুন তারসঙ্গে কবি অঙ্কন করেছেন। তবে রাধার এই বিরাগ কি সত্যই, না কি ভিতরে ভিতরে নারী হৃদয়ের মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল, তা আমরা আলোচনা সূত্রে বিচার করবো। সুকুমার সেন রাধা চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'' নামে প্রকাশিত এই পাঞ্চলিকা গীতিনাট্যটি যিনি রচনা করিয়াছিলেন তিনি বড় কবি, ... ইহাতে তিনটি মাত্র ভূমিকা কৃষ্ণ, বড়াই ও রাধা। তিনটিই নিজ নিজ চরিত্রে উজ্জ্বল হইয়াছে। তাহার মধ্যে রাধা চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে কবি যে দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুরাণো বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত।''
>
> ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খন্ড)

সুকুমার বাবুর 'চাতুর্য' শব্দটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। কারণ রাধা যে খুব চতুরতার সঙ্গে কৃষ্ণের সাথে প্রথম থেকেই আচরণ করেছেন তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে দেখতে পাবো।

রাধার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গেলে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের দিকে প্রথমে আলোকপাত করা প্রয়োজন। ফ্রয়েড নারীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে নারীর সম্ভাব্য কয়েকটি প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন। অন্যতম একটি হলো যৌন সংসর্গে প্রাথমিকভাবে বাধাদান। কিন্তু অন্তরে প্রবল ইচ্ছা। আমরা কাব্যের প্রথম থেকেই রাধার কৃষ্ণ বিরাগের অভ্যন্তরে এই বাধাদানের বিষয়টিই লক্ষ্য করবো। মূলত রাধার 'না'-র মধ্যেই 'হ্যাঁ' লুকিয়ে থাকার মনস্তত্ত্বটি উদ্ঘটিত হয়েছে। নারীর 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

না' তত্ত্বটিই যেন এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে।

আর একটি বিষয় এখানে বলতে হয়, তা হলো কবি রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কের বিষয়টি 'জন্মখন্ডে'ই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন এবং তার উপযুক্ত পরিস্থিতিও তিনি কৌশলে জানিয়ে দিয়েছেন।

''কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে।।''

এবং রাধাকে মর্তে পাঠানো হলো 'নপুংসক আইহনের রাণী' রূপে। সুতরাং রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রটি কবি সুকৌশলেই প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাছাড়া কৃষ্ণ যে আসলে নারায়ণ তা রাধার জানা ছিল। তিনি দানখন্ডের ৬২ নং পদে কৃষ্ণকে বলেছেন—

''শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ।
দান সাধ কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ পথত বসিআঁ।।''

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পরিহার করে পথে বসে কেন দান চাইছ? কৃষ্ণও রাধাকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, রাধা তাঁর মামী নয় শালী — 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী' (দানখন্ড, ৫৫)। এর আগে ৫২ নং পদেও রাধাকে কৃষ্ণ জানিয়েছে—

''হইএ আম্হে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী।''

'তাম্বুলখন্ড' বড়াই মারফৎ কৃষ্ণ প্রেরিত প্রেমপ্রস্তাবের বিরোধিতা দিয়েই শুরু হয়েছে রাধার বাধাদানের প্রতিক্রিয়া। ২২ নং পদে রাধার বাধাদানের ছবি রয়েছে—

''এ বোল সুনিআঁ নাগরী রাধা হাণএ সকল গাত্র।
যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাত্র।।''

কেবল তাই নয়, বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করতে জোর করেন এবং বোঝান কৃষ্ণকে স্মরণ করলে পাপ নাশ হয়, মুক্তি ঘটে। তখন রাধা বলেন, তিনি বালিকা অবলা সুরতি সম্ভোগেরও যোগ্য নন 'নহোঁ সুরতী যোগে' (ঐ ২৩ নং)। তিনি পরিষ্কার করে আরও বুঝিয়ে বলেন—

''জৈসাণে রতি জানবোঁ।
তেসানে কাহ্ন আনিবোঁ।
সুরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ।।''

এবং সুরতি জানলে 'তোষিব তাহাক আম্হে সংপুন্ন যৌবনে' (২৪নং) অর্থাৎ, সুরতি জানলে আমার পূর্ণ যৌবন দিয়ে তাকে আমি তুষ্ট করবো। রাধার এই প্রতিশ্রুতি দানের মধ্যে আমরা তাঁর মনস্তত্ত্ব সহজেই অনুধাবন করতে পারি। আসলে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে তাঁর কোনো অনিচ্ছা নেই। কেবল রতি জাগার অপেক্ষায় বা রতির ক্রিয়াকলাপগুলি ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার সময়টুকু চেয়েছেন। কারণ তাঁর স্বামী নপুংসক। ফলে রতি বিষয়টাতে জ্ঞানলাভ না ঘটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া সখীরাও তাঁকে এ বিষয়ে কখনো অবহিত করেন নি। তাই সুরতি না জানলে কৃষ্ণকে তৃপ্ত করা এবং নিজেও তৃপ্তি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হবে। স্বামী নপুংসক হওয়ায় তাঁর অবচেতনে তৃপ্ত হওয়ার বাসনা জাগাই স্বাভাবিক। সুতরাং কাব্যের প্রথম থেকেই রাধার মনে কৃষ্ণ বিরাগ নয়, কৃষ্ণের সঙ্গলাভের অনুরাগ জন্মেছিল।

তা পরবর্তী কৃষ্ণের সঙ্গলাভের ইচ্ছা যে রাধার প্রবল তা পরবর্তী ২৭ নং পদে আরও স্পষ্ট হয়েছে অন্যভাবে। রাধা পর স্ত্রী। সংসার সমাজ রয়েছে। যা কৃষ্ণ মিলনে তাঁর কাছে চরম বাধা বলে মনে হয়েছে। কৃষ্ণের প্রেম প্রস্তাব রাধার অতৃপ্ত অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার অনলে ঘৃতাহুতি দিয়েছে যেন। তাই বড়াই বার বার কৃষ্ণের প্রেমপ্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ করলে রাধা বলেন—

''বার বার বুলিহ হেনক উত্তর।
স্বামী দুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর।।''

অর্থাৎ, তাঁর স্বামী দুর্বার এবং তিনি স্বাধীন নন। তাই বার বার কৃষ্ণের প্রসঙ্গ যেন না তুলেন। আসলে স্বামী তথা সংসার তথা সমাজের ভয়ে তিনি এগোতে পারছেন না। তিনি যদি স্বাধীন হতেন, স্বামীর

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

ভয় না থাকত তাহলে কোনো সমস্যা হত না। এই বাধাগুলির কারণে তিনি কৃষ্ণের প্রেম গ্রহণে অপারগ। তাই মনে প্রবল ইচ্ছা থাকলেও মিলিত না হতে পারার কষ্টে প্রসঙ্গ ভুলে থাকতে চেয়েছেন।

কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগ স্বামী তথা সমাজ-সংসার যে বাধা স্বরূপে, তা 'দানখন্ডে'র একটি বেশির ভাগ পদেই রয়েছে কৃষ্ণের জোরপূর্বক রাধা সম্ভোগের তাড়না। আর রাধার বারবার বাধাদানের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে কৃষ্ণ সঙ্গলাভের প্রবল ইচ্ছা। ১৪১ নং পদে রাধা দেহদানের সম্মতি দিয়েছে কিছু শর্তের বিনিময়ে। সেই সময় তিনি জানান শরীরে মিলনের কোনো চিহ্ন থাকলে—

''আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিকঁ নিস্তারে।''

অর্থাৎ, স্বামী আইহন দেখলে তার নিস্তার নেই। তাহলে আইহন না দেখলে কোনো আপত্তি নেই ? আইহন আসলে সমাজ সংসারের প্রতীক। এই সমাজ সংসারের ভয়েই রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে ভয় পাচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে এই পদে এসে দেখব দেহদানের পূর্ব রাধা শর্ত আরোপ করছেন—

''সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তবেঁ যাওঁ তোর কোল।
কভোঁ না লঙ্ঘিবেঁ যঁবে আহ্মার বোল।''

অর্থাৎ রাধার কথা কখনো লঙ্ঘন না করলে তবে তিনি কৃষ্ণের কোলে যাবেন। সেই শর্তগুলি হল — 'মাথার মুকুট, 'সাতেমরী হারে,' দেহের অন্যান্য অলংকারগুলি যাতে না ছেঁড়ে এবং শরীরে যেন মিলনের কোনো চিহ্ন না থাকে —

'আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে,'
'নখঘাত না দিহ মোর পায়োভারে' প্রভৃতি।

সুতরাং রাধার যদি কৃষ্ণ মিলনে ইচ্ছাই না থাকত, তবে শর্তদানের প্রসঙ্গ কখনোই আসত না। কারণ জোরপূর্বক সম্ভোগ কখনোই শর্তসাপেক্ষে হয় না। তাছাড়া এই শর্ত ও আসত না এসেছে কেবল স্বামী, সংসার সমাজের ভয়ে।

'নৌকাখন্ডে'ও সমাজ সংসারের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা বোধও জাগ্রত। কারণ নৌকা পারকালে মাঝ যুমুনায় প্রচন্ড বাতাস ও ঢেউ এ নৌকা টলমল করলে রাধাকৃষ্ণের কোলে আশ্রয় চেয়ে বলেন—

''কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বঢ়ায়ি জুনী জাণে।
বড়ায়ি জাণিলে জানে কংস আইহনে।।''

অর্থাৎ, কোলে করুক কৃষ্ণ। কিন্তু সে কথা যেন বড়াই না জানতে পারে। জানলে কংস জানবে, আইহন জানতে। যে বড়াই তাঁদের মিলনের দূতী এবং প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই দুজনে চলেছেন, সেই বড়াইকে না জানানোর কথা বলেছেন। অজুহাতে এই যে, বড়াই কংস ও আইহন সব বলে দেবেন। আসলে রাধার মনে প্রেমের স্ফূরণ থেকে লজ্জা বোধ জেগেছে। তাই বড়াইকেও এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। শুধু বড়াই নয়, সখিরাও যাতে না দেখতে পায় তাঁদের মিলন, সে জন্য রাধা বলেন—

''যে কর সে কর তুঞিঁ মোরে জলের ভিতর।
হোর সব সখিজন দেখে তাক মোর ডর।।''

আসলে সখিরা দেখে নিলে ভয় নয়, লজ্জা হবে। এবং কষ্ণের আলিঙ্গনে—

''রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গণ।''

সেইসঙ্গে 'রাধা অতি রতি সুখে' তৃপ্ত হলেন। দানখন্ডে সম্ভোগকালে রাধা রতি বিষয়ে ছিলেন অনভিজ্ঞ। কিন্তু দানখন্ডে সম্ভোগের ফলে অভিজ্ঞ ধারা এখন রতি সুখে তৃপ্ত হয়েছেন। বলতে পারি এখানেই রাধা প্রথম দেহসুখ উপভোগ করেন। এই দৈহিক সম্পৃক্তিই কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমকে অঙ্কুরিত করে তোলে। এখানেই রাধার মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন—

''চেতনা জাগিলে জাগে লজ্জা; তখন অন্য

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

আচ্ছাদন না পাইলে একাত্ম আত্মজনের নিকটও মানুষ সংকুচিত হইয়া লজ্জা ও ছলনার তলে আত্মগোপন করিতে চায়।''

('মধ্যযুগের কবি ও কাব্য')

'ভারখন্ড' ও 'ছত্রখন্ডে' রাধা প্রেমের ব্যাপারে বেশ খানিকটা বিকশিত হয়েছেন। 'ভারখন্ডে' রাধা মিলনের আশা দিয়ে কৃষ্ণকে দধি-দুধের ভার বহন করিয়েছেন। আর 'ছত্রখন্ডে' লোভ কৃষ্ণকে তাঁর মাথায় ছাতা ধরিয়েছেন।

রাধা এখন চতুরা নায়িকা। বৃন্দাবন খন্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেম গভীরে এসে পৌঁছায়। এতদিন যে রাধাকে বড়াই কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করে বৃন্দাবনে কৌশলে নিয়ে যেত, এখন সেই রাধা বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব। বৃন্দাবনেই প্রথম রাধার মনে কৃষ্ণের প্রতি মান ও ঈর্ষা দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে শঙ্করী প্রসাদ বসু বলেছে—

''মান প্রেমের এক পরিপক্ক অবস্থা।''

প্রেম সম্পর্কে নিশ্চয়তা বা অধিকার বোধ না জন্মালে মান জন্মাতে পারে না। 'বৃন্দাবন খন্ডে' রাধার সেই অধিকার বোধ জন্মেছে। 'বৃন্দাবনখন্ডে' যে প্রেম পরিপক্ক রূপ পায়, 'কালীয় দমনখন্ডে' এসে সেই প্রেম প্রথম জনসমক্ষে প্রকাশ পায়। কালীয়াদহে নিমজ্জিত কৃষ্ণের জন্য রাধার বিলোপোক্তি-

''ধিকছুক কাহ্নাঞিঁ সে কালীনাগে
আহ্মা না দংশিল তোহ্মার আগে।''

'যমুনাখন্ডে' ও 'হারখন্ডে' রাধার আচরণ ও মনোভাব আপাতদৃষ্টিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বিপরীতমুখী বলে বোধ হলেও আসলে তা মনেরই আর এক পর্যায়। আমরা জানি যে প্রেমিকের প্রতি বিশ্বাসবোধ যখন দৃঢ় হয় তখনই অভিমান সম্ভব। রাধা বড়াইকে বলেন—

''কি করিব ধনজন জীবন ঘরে
কাহ্ন তোহ্মা বিনি সব নিফল মোরে।''

এ উক্তি কিন্তু দানখন্ডের আপাত বিদ্রোহিনী রাধার নয়, এ প্রেমলীলায় অভিজ্ঞ শ্রীরাধিকার বিলাস বচন।

'বংশীখন্ডে' কৃষ্ণের বাঁশি বেজে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে সেই বাঁশি বাজে রাধার মাঝে। কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে তাঁর দাসী হওয়ার বাসনা জেগেছে রাধার।

''কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাত্র নিশিবোঁ আপনা।।''

বাঁশীর শব্দে তাঁর প্রাণ হরণ করেছেন কৃষ্ণ। রাধা এখন কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী। সমাজ সংসার সমস্ত কিছুকে জলাঞ্জলি দিতে এখন তাঁর আর কোনো ভয় বা শঙ্কা নেই। তুচ্ছ মনে হয় নিজের রূপ দেহ, যৌবন। বরং বাঁশীর শব্দে এখন মনে হয় রাধা নিজে আগুন জ্বেলে, সেই আগুনে পুড়ে মরবে। কারণ—

''তার বাঁশীর শব্দ শুনী।
পরাণ জাএ মোর গুণী।।''

অর্থাৎ কৃষ্ণের বাঁশী শুনে রাধার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা।

'রাধাবিরহ'-এ দেখা যায় কৃষ্ণবিরহে রাধার তীব্র ব্যাকুলতা। কংস নিধনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ মথুরায় চলে গিয়েছেন বৃন্দাবন অন্ধকার করে। রাধার হৃদয়ও অন্ধকার। বসন্ত আগমনে রাধা বিরহ যন্ত্রণায় কাতর—

''আইল চৈত মাস কি মোর বসতী আশ
নিফল যৌবন ভারে।।
বিরহে আন্তর জলে সুতিলোঁ কদমতলে
অধিক আন্তর মোর পোড়ে।।''

(৩৫০নং)

অবশ্য রাধার এই বিরহ যন্ত্রণার মূলে যে কামনা-বাসনা, তা রাধা নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, কৃষ্ণ মিলনের পূর্বে তাঁর রতি জ্ঞান ছিল না।

''আছিলোঁ মোঁ শিশুমতী না জানিলোঁ রঙ্গরতী
এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ।
অহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী
এবেঁ কৃষ্ণ করহ আদেশ।।''

রতিজ্ঞান প্রাপ্তির পর কৃষ্ণকে ছাড়া তিনি বাঁচতেই

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

পারছেন না—

''গোপীর বালেন্দ হরি আন্মো রিবহিণী নারী
তোন্মা বিনি বঞ্চিতেঁ না পারী।।''

এভাবেই দেখা যায়, কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাধার কামনা-বাসনাময় রূপ। কাব্যের শুরুতে 'না' এর মধ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণের আলিঙ্গনের ইচ্ছায় বাধাদানেরে মধ্যে গভীরভাবে ক্রিয়াসীল ছিল রতি মিলনের ইচ্ছা। পরবর্তীকালে তা ধীরে ধীরে প্রেমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এবং শেষ অংশে এসে কৃষ্ণ বিরহে কামনার জ্বালা যন্ত্রণা প্রগাঢ়তর হয়েছে, যা রাধাকে কৃষ্ণ উন্মাদিনী পাগলিনী রাধাতে পরিণত করেছে। তবে প্রেম থেকে রাধার মধ্যে যে ছদ্ম আবরণ ছিল, তা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে। বড়ু চন্ডীদাস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এভাবেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন : বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দে'জ, কলকাতা, ২০১৬।

(২) মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার (সম্পা), শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০১৬।

(৩) মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ : কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ, দে'জ, কলকাতা, ১৪২৪।